নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৭, পৃ: ১-১৯
© ২০০২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রতিক এনজিও বিতর্ক ঃ মাঠ গবেষণার আলোকে একটি পর্যালোচনা

এস, এম, নুরুল আলম*

পটভূমি ও প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই এনজিও কার্যক্রম বিরাট পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষও 'ইনজিও' (enjio) শব্দটির সাথে পরিচিত। অনেক সময় দেখা যায় গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ এনজিও'র মানে যা বোঝেন এবং তার সাথে যারা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাদের ধ্যান ধারণার বিশাল পার্থক্য রয়েছে (নাহার, ১৯৯৯)। আর এই পার্থক্যই সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তি, অস্পষ্টতা ও ভুল বোঝাবুঝি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সমসাময়িক বাংলাদেশে ব্যাপক পরিসরে এনজিও'র উপস্থিতি ও কার্যক্রম থাকা স্বত্ত্বেও তাদের ভূমিকা, কার্যক্রম, কর্মকান্ডের কৌশল ও নীতিমালা সবার কাছে সমভাবে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য নয় (আলম ১৯৯৫, হাশেমী ১৯৯০, ১৯৯৪)। কিন্তু কেন?

এই কেন'র উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে।। বস্তুতঃ ১৯৯৪ সাল ও পরবর্তীতে এনজিও কে ঘিরে কিছু ঘটনা এবং মাঠ কর্মের ভিত্তিতে সেই ঘটনাগুলোর নিবিড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে এনজিও সম্পর্কিত অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির একটি মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সমসাময়িক বাংলাদেশে এনজিও'র একটি শক্তপোক্ত অবস্থান রয়েছে এবং তারা নারী উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়-সৃষ্টি প্রকল্পে নারীদের সম্পৃক্তকরণ, স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা, বয়স্ক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক বনায়ন, পরিবেশ সহায়ক কৃষি এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনী সহায়তা দান ইত্যাদি বিষয়ে খুবই প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিওকে অনেকে বিকল্প প্রতিষ্ঠান[২] (alternative institution) (আলম, ১৯৯৩) আবার অনেকে এনজিও কে উন্নয়নে বেসরকারী খাত (private sector) (আলম, ১৯৯০) হিসেবেও দেখছেন। কিন্তু এটা বোধগম্য নয় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা থাকা স্বত্ত্বেও এনজিও কার্যক্রম কেন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য+হচ্ছে না। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

যে, এনজিও নিয়ে যে অস্পষ্টতা ও ভুল বোঝাবুঝি আছে তার পেছনে এনজিওগুলির ভূমিকা আছে। এনজিওগুলো জনগণের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারেনি এবং এনজিও-কে ঘিরে যে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তাও স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যার প্রয়াস নেয়া হয়নি। এটাই সমস্যার মূল।

১৯৯৪ সালে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধ লেখা। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে আছে মৌলবাদী আক্রমণের ঘটনা এবং এনজিও কার্যক্রম বন্ধের দাবী। কিছু ধর্মভিত্তিক দল সেই সময় এনজিও-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সমাবেশ্ করে এবং ঢাকার দিকে লংমার্চ করে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিও-র বিতর্কিত ভূমিকা। এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে কিছু এনজিও-র সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। তৃতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল ইদানিং গ্রামীণ পরিসরে এনজিও-র বিভিন্ন কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের (ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান) ভূমিকাকে হ্রাস করছে। এমনকি গ্রামে প্রচলিত সরকারী সংগঠনের বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন যেমন, সমাজ এবং সালিশের ভূমিকাকেও খর্ব করছে। এতে এনজিও-র কার্যক্রম নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্যের উৎসঃ

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য এবং চিন্তা ভাবনা গৃহীত হয়েছে লেখকের দুইটি গবেষণা থেকে। একটি পরিচালিত হয় ১৯৯৪ সালে এনজিওগুলোর ওপর কিছু মহলের আক্রমনের ঠিক পর, অন্য গবেষণাটি করা হয় ১৯৯৬ সালে যার বিষয় ছিল- এনজিও এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সম্পর্ক। মিশ্র কৌশল অবলম্বন করে সাহায্যে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অকাঠামোগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং বহু সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলা হয়। এছাড়া উন্মুক্ত প্রশ্নপত্রও ব্যবহার করা হয়। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে নয়টি জেলার পঁচিশটি থানায় আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা এবং গবেষিত জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এনজিও কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করা এবং এই কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রপঞ্চকে বিচার বিশ্লেষণ করা। সাধারণভাবে তথ্য প্রদানে মানুষের সহযোগিতা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তবে এনজিও মাঠকর্মীদের তথ্য প্রদানে অনীহা, কেন্দ্রীয় অফিসের অনুমতি ছাড়া কোন তথ্য দেয়া যাবে না এবং সব সময়ই একটা গোপনীয়তা রক্ষা করার দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে হতাশ করেছে। এ প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যকে সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও প্রবন্ধের তথ্য ও ব্যাখ্যা ১৯৯৪-৯৬ সালের তবে এটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব যে এসকল তথ্য ও ব্যাখ্যা বর্তমান প্রেক্ষাপটেও বহুলাংশে প্রযোজ্য।

উপরোক্ত অংশ ছাড়া প্রবন্ধের আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অংশে এনজিও বিতর্কের প্রধান বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বির্তকের চিহ্নিত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষ এনজিও এবং উন্নয়নকে কিভাবে দেখে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অংশে এনজিও ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সবশেষে মন্তব্যের মাধ্যমে প্রবন্ধটির উপসংহার টানা হয়েছে।

প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীঃ

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহকে সামনে রেখে প্রবন্ধের প্রধান বিষয়গুলো আলোচিত হবে।

- এনজিও কার্যক্রম নিয়ে যদি ভুল ধারণা এবং সন্দেহ থেকে থাকে তবে তার কারণ কি?
- এনজিওকে ঘিরে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও দলগুলোর মূল আপত্তি এবং অসন্তোষের কারণ গুলো কি?
- স্থানীয় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো (formal and informal) কিভাবে এনজিও কার্যক্রমকে দেখছে এবং এখান থেকে কোন বিরোধিতা/প্রতিরোধের সম্ভাবনা আছে কিনা তা বোঝা।
- নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রধান আপত্তিগুলো কি এবং এ আপত্তিগুলোর পেছনে কি কারণ রয়েছে।

  যদিও এনজিওগুলো জনগণের সাথে জনগণের জন্য কাজ করে, তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী 'টার্গেট গ্রুপের' প্রতি নজর দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের সাথে এক ধরণের দূরত্ব তৈরী করে। নানা কারণে এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা এবং সন্দেহ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। গত দুই দশকে এনজিওগুলো জনগণের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ, সমাজের জন্য নিরপেক্ষ কোন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারেনি। এনজিও কার্যক্রম নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহকে চিহ্নিত করা যায় ঃ

- সমগ্র দেশের জন্যে একটি কার্যক্রমের কৌশল।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে এনজিও কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের আঞ্চলিক, স্থানীয় ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতাকে সঠিক এবং নিবিড়ভাবে অনুধাবনে অক্ষমতা।

- টার্গেট জনগোষ্ঠীর উপর বেশি নজর দেয়া।
- নারীর অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়া।
- পুরুষরা নারীদের সমান সুযোগ ভোগ করছে না এরকম ধারণা।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে সুবিধা প্রাপ্তির অবাস্তব প্রত্যাশা।
- এনজিও কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ছাড়া স্থানীয় জনগণের সাথে কর্মীদের কম সম্পৃক্ততা।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও-র মধ্যকার সম্পর্ক।

প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উপরোক্ত বিষয়গুলোর কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রবন্ধের ব্যাখ্যার সাথে সবাই একমত হবেন বলে আশা করিনে, তবে আমার দেয়া তথ্য, ব্যাখ্যা ও মন্তব্য এনজিও সম্প্রদায়ে কিছু চিন্তার খোরাক যোগালে আমার প্রচেষ্টা সার্থক বলেই ধরে নেব।

সমকার্যক্রম কৌশল

এনজিওগুলো সাধারণভাবে বিভিন্ন এলাকার জন্য একই রকম কার্যনীতি তৈরী করে। এখানে প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা হলো সমগ্র বাংলাদেশের জন্যে একই রকম কার্যক্রম ও কৌশল কতটুকু পর্যন্ত প্রযোজ্য। ব্র্যাক এর গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প কিংবা আশা'র ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্প কিংবা বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী যাই হউক তা কি একই ধরণের কৌশলের মাধ্যমে সমস্ত দেশে বাস্তবায়ন সম্ভব? যদিও দৃশ্যতঃ বাংলাদেশে ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও মূল্যবোধে সমরূপতা আছে কিন্তু এই সমরূপতার মাঝেও বহু ধরণের বৈপরীত্য ও পার্থক্য লক্ষণীয়। আমি খুব স্পষ্ট নই এনজিওগুলো বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নে স্থানীয় বাস্তবতা যেমন, মানুষের আচরণ, মূল্যবোধ, পরিবারে নারীর ভূমিকা, গৃহস্থালি পরিসরের বাইরে নারীর উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কতটুকু বিবেচনায় আনে তা স্পষ্ট নয়। আমি মনে করি, বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক, স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোকে বিবেচনায় এনে যদি একটি আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানচিত্র (socio-economic and cultural mapping) তৈরী করা যায়, তবে তা এনজিও-র কর্ম পরিকল্পনা তৈরী এবং বাস্তবায়নে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে (আলম ১৯৯৫)। এই গবেষণায় এনজিও বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, টার্গেট গ্রুপের উপর বেশি নজর দিয়ে এনজিওগুলো গ্রামে একটি নতুন সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণী (a new privileged group) তৈরী করছে (আলম ১৯৯৫)।

কার অংশগ্রহণ?

বিভিন্ন কার্যক্রমে দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং এনজিও'র সুবিধা গ্রহণ সম্পর্কে তাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রধান

বিষয় হচ্ছে, এনজিওগুলো কতদূর পর্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের কর্মসূচীতে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সত্যিই কি তারা হত দরিদ্র মানুষকে কার্যক্রমে সংযুক্ত করতে পারছে? স্থানীয় এলাকায় প্রকৃত দরিদ্র মানুষকে কি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে? এনজিও কর্মীদের অধিকাংশই স্থানীয় এলাকার বাইরে থেকে আগত। আমরা দেখেছি কয়েকটি ক্ষুদ্র ঘটনা ছাড়া এনজিওগুলোর প্রকল্প এলাকায় টার্গেট দল নির্ধারণ করা হয় স্থানীয় সিভিল সমাজের সাথে দূর্বল যোগাযোগের মাধ্যমে। দলের অনেক সদস্যই আসলে দলে আসার যোগ্যতা রাখে না। এরকম দৃষ্টান্ত আছে যে, কিছু এনজিও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে খুশী রাখার জন্যে সদস্য নেন, যাতে ঐ নির্দিষ্ট এনজিও-কে ভবিষ্যতে ঐ এলাকায় কাজ করতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় এবং নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে (আলম ১৯৯৫)। আমরা এটাও দেখেছি যে, একই ব্যক্তি একাধিক এনজিও-র সদস্য। এনজিওগুলোর মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব আছে এটা তাই প্রমাণ করে। তবে অধুনা কিছু কিছু এনজিও তাদের কাজের সমন্বয় করার চেষ্টা করছে যাতে ওভারলেপিং বর্জন সম্ভব হয়।

এনজিওর কর্মকর্তা এবং কর্মীদের পরিকল্পনা তৈরীতে যে সম্পৃক্ততা তাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতাকে ভাল বোঝেন এবং জানেন। কিন্তু প্রকল্প প্রণয়নে তারা কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে এবং তাদের মতামতকে সব সময় গুরুত্ব দেয়া হয় কি না তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। আমাদেরকে কিছু এনজিও-র কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা প্রধান কার্যালয়ের দেয়া পরিকল্পনার ছকই অনুসরণ করেন। অনেক এনজিও-র পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা আছে। অনেক ক্ষেত্রে দাতা গোষ্ঠী থেকে এনজিও গুলোকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করে দেয়া হয় যে কতগুলো দল গঠন করা হবে বা কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে। এ অনুযায়ী এনজিওগুলো তাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর বিস্তার ঘটায়, খুব তাড়াতাড়ি সেই লক্ষ্যে পৌছার জন্য। এ জন্য দেখা যায় যে অনেক এনজিও স্থানীয় বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন ধরণের আয় সংস্থানকারী কর্মসূচী প্রণয়ন করে। দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপকারের চাইতে দাতা গোষ্ঠীর নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনই মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে যদি মাঠকর্মীরা তাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, নিয়মনীতি কিছু পরিবর্তন করতে চান তা কতটুকু সম্ভব তা স্পষ্ট নয়। এনজিওগুলো কতদূর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের পরামর্শ গ্রহণে নমনীয় এটা যথাযথ গবেষণার অপেক্ষা রাখে। এই বিষয়গুলোকে প্রমাণ করার জন্য আমাদের আরো উদাহরণ দরকার, তবে বাংলাদেশে এনজিও সেক্টরে আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি এবং এর ক্রমাগত বিকাশের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আমি মনে করি এনজিওগুলোর বিভিন্ন সাফল্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মাঠ কর্মীদের সাথে দলের সদস্যদের আন্তরিক এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এটা লক্ষ্য করেছি যে, দলের দরিদ্র সদস্যটি সে পুরুষ অথবা মহিলা যেই হউন না কেন

এনজিও কর্মীদের কাছে তাদের রয়েছে অবাধ যাতায়াত। এবং তারা যে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। অনেক এনজিও তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এনজিও কর্মী আছেন যারা স্থানীয় জনগণের সাথে খুব সহজে মিশে গেছেন। এই কর্মীরা সাধারণ মানুষের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। শহুরে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাজের ক্ষেত্র যে শুধুমাত্র শহর নয়, গ্রামও হতে পারে এনজিও গুলো এ সমস্যাটি উপলব্ধি করাতে সহায়তা করেছে যা প্রশংসার দাবী রাখে।

নারীর অংশগ্রহণ

এটা আগেই বলা হয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সংযুক্তি এনজিওগুলোর প্রধান অর্জন। বর্তমানে এনজিও কর্মকাণ্ডের বেশির ভাগ সুবিধা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী হলো নারী। এনজিও-র কর্ম পরিকল্পনায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মহিলাদের অন্তঃর্ভূক্ত করা হয়। এরা হলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধনী, মধ্য ও প্রান্তিক কৃষকের স্ত্রী, ভূমিহীনের স্ত্রী, তালাক প্রাপ্তা, বিধবা, স্বামীর কাছে থেকে আলাদা থাকেন এরকম পরিত্যাক্তা মহিলা। প্রধানতঃ নারীদের নিম্নলিখিত কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়- (আলম, ১৯৯৩)ঃ

- সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম প্রত্যয়ী করে তোলা।
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।
- ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পুঁজির যোগান।
- আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা দান।

এনজিও-র সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবিধাপ্রাপ্তরা শুধু মহিলা বলে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের একটি পার্থক্য তৈরী হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে কেন শুধুই মহিলাদের প্রতি নজর দেয়া হয়? মহিলাদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী বহুভাবে পুরুষদের প্রভাবিত করে। আমাদের সমাজে পুরুষদেরকে মনে করা হয় 'অভিভাবক' এবং 'অন্নদাতা' হিসাবে আর মহিলাদের মনে করা হয় তাদের প্রতি নির্ভরশীল হিসেবে। এই ধরণের পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসে ও নিয়মকানুনে, আচরণে এবং মূল্যবোধে যা আবার ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নির্ধারিত। নারীদের ঘিরে আবর্তিত কিছু ধ্যান-ধারণা, সমাজে নারীর মর্যাদা, অবস্থান নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস ইত্যাদির কারণে মূলধারায় সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ ও সংযুক্তি একটি দূরুহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। আমি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব বাঁধা আছে তা নিম্নে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিঃ

- বর্তমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে নারীর প্রচলিত ভূমিকা সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা।
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।
- নারীর চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ সৃষ্টির অভাব।
- পুরুষের তুলনায় নারীকে নাজুক ভাবা।
- যুগে যুগে প্রচলিত ধারণা নারীর অবস্থান গৃহস্থালীর পরিসরেই।

তাই স্থানীয় আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এনজিও কার্যক্রম পরিচালিত এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে মানুষ সচেতন কিনা এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি কতটুকু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ মানুষ নিতে সক্ষম কিংবা আগ্রহী। সচেতনতার অভাবে সাধারণ মানুষ, ধর্মীয় নেতা, মসজিদের ইমাম, গ্রাম প্রধান, কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষকের মধ্যে বিরোধীতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটো উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যায় (আলম ১৯৯৫)ঃ

সরাইল এর একজন ধর্মীয় নেতা বলেন, ‘‘যদি কোন পুরুষ ঋণের জন্যে আবেদন করে তখন তারা আগ্রহ দেখায় না। দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক রয়েছে যারা ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে অথচ ঋণ দেয়া হয় মেয়েদের। যখন পুরুষরা কাজ করতে সক্ষম তখন মেয়েদের ঋণ দেয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।’’

যশোরের একজন বৃদ্ধ বলেন, ‘‘এনজিও-রা মেয়েদের ঋণ দিচ্ছে। আমি বুঝিনে কেন? এটা কি এতই জরুরী? কিন্তু আমরাতো বুড়ো। কেউ আমাদের কথা কিংবা পুরুষদের কথা ভাবে না। তারা মেয়েদের নিয়েই ব্যস্ত।’’

কেউ এটা বলতে পারেন যে এই দুটো উদ্ধৃতি ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু আমি গুরুত্ব দিতে চাই এর ভেতরকার সত্যকে, যাকে মোটেই উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। এই দুটো উদ্ধৃতির মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটেছে তা আমাদের মাঠ গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশে যেখানে ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে সেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে যেকোন ক্ষুদ্র ঋণ অথবা অর্থ সাহায্য বড় ধরণের আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। তাই যখন এনজিওগুলো কারো জন্য অর্থ বা সাহায্যের যোগানদাতা হিসাবে কাজ করে তখন এটা বাকীদের মনে বঞ্চনা, অবহেলা ও উপেক্ষার অনুভূতির জন্ম দেয়। মানুষ এটা জানে যে দারিদ্র দূর করার সুযোগ খুব সীমিত যা জ্ঞান-দরিদ্র ও সুযোগ-বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে আরো হতাশা ও অসন্তোষের জন্ম দেয়। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরণের ফলাফলই আছে। ইতিবাচক দিক হলো এটা মানুষকে কাজের প্রতি আরো উৎসাহী করে তোলে। কেননা মানুষ কাজ করতে চায় সাফল্যের জন্য। নেতিবাচক দিক হলো মানুষের মধ্যে হতাশা আর

নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দেয় যা মাঝে মধ্যে বিরোধিতা ও উম্মাদনার জন্ম দেয়। কিন্তু সমস্যা হল এনজিওরা সাধারণ মানুষের মন থেকে এই ধরণের হতাশা দূর করার কোন প্রয়াস তেমন চালায়নি, ফলে পুরুষ এক ধরণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে।

উন্নয়ন ডিসকোর্সকে যেভাবে বাংলাদেশে আত্মস্থ করা হয়েছে তা সমস্যাজনক হলেও এর প্রধান সুবিধাগ্রহণকারী এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে নারীরা সামনে এসেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সরকারী এবং এনজিওর বিভিন্ন পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীর উন্নয়ন দশকে (১৯৭৫-৮৫) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে নতুনভাবে দিক নির্দেশনা দেয়। এই সময়ে নারীকে প্রধান টার্গেট দল হিসাবে চিহ্নিত করে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের ওপর আরো বেশি মনোযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তবুও তেমন বিশেষ কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের চিরকালীন টানাপোড়েন এখনও বিদ্যমান এবং একই ধরণের পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শিক চাপ সব সময় সব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলে। কিন্তু এ ধরণের প্রচলিত ধারণা পরিবর্তনের প্রয়াস খুব চালানো হয়নি।

এনজিওদের ঋণ কার্যক্রম ঃ সুদের হার ও ঋণের উদ্ধার

গবেষণাকালে আমরা এনজিও ঋণের উচচ সুদের ব্যাপারে মানুষের মাঝে একটা অসন্তোষ দেখতে পাই। বিভিন্ন ধরণের অভিযোগের মধ্যে আছে একজন দরিদ্র মানুষকে ঋণ দেয়ার পরে এনজিওগুলো কৌশলের সাথে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ঋণ দেয়ার সময় এনজিওগুলো একটা অংশ কেটে রাখে। কেন এটা কেটে নেয়া হচ্ছে তা আমরা জানি না এ ধরণের অবস্থা এনজিও ঋণ প্রকল্পের ব্যাপারে এক ধরণের ভুল বোঝাবুঝি আর সন্দেহের জন্ম দেয়। এনজিও-র ঋণ প্রকল্পের ব্যাপারে আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে প্রদত্ত ঋণ সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া ও ঋণের টাকা ব্যবহার ও সুদের উচ্চহার ইত্যাদি। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, সুদের উচ্চ হার এবং এনজিওরা যেভাবে ঋণের টাকা উদ্ধার করে তার ব্যাপারে জনগণের ভেতরে একটা সাধারণ অসন্তোষ রয়েছে। মানুষের মন থেকে এসব ভুল ধারণা দূর করার কোন উদ্যোগই এনজিওগুলোকে নিতে দেখা যায় না।

ঋণ দেয়ার পর পরবর্তী কাজ হচ্ছে ঋণের টাকা উদ্ধার। বেশির ভাগ এনজিওই তাদের ৯০-৯৫% ঋণ উদ্ধারের ব্যাপারে গর্ব করে থাকে। এই ঋণ উদ্ধারের সময়টা এনজিও কর্মীদের সবচাইতে উদ্বেগজনক ও বিব্রতকর সময় বলে লক্ষ্য করেছি। মাঠকর্মীদের তাদের টাকা উদ্ধারের লক্ষ্যমাত্রা যে কোনভাবে অর্জন করতে হয়। এনজিওগুলোর প্রদত্ত ঋণের টাকা ফেরত নেওয়ার বিভিন্ন পন্থা সাধারণ জনগণ, এনজিও সমালোচক এবং গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে সমালোচিত হয়।

এটাও শোনা গেছে যে অনেক সময় এনজিও কর্মীরা তাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে টাকা উদ্ধার না করতে পারলে অন্যত্র বদলি করে দেয়া হয়। কোন ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণ উদ্ধার বেশ কিছু বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। যেমন- ঋণগ্রহীতার অতীত; ঋণের টাকা উৎপাদনশীল ও লাভজনক কোন খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এনজিও কর্মীদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ।

মাঠকর্ম থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি অনেক এনজিওই তাদের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী। যে কারণে একই ব্যক্তির একাধিক এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যায়। ঋণ পাওয়ায় সহায়তা করার জন্যে গ্রামের টাউটদেরও সুযোগ তৈরী হয়। অন্যদিকে ঋণ গ্রহীতারা লাভজনক বিনিয়োগ করতে না পারলে তখন ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়ে ঋণ খেলাপী হয়ে যায়। ঋণের টাকা কোন ক্ষেত্রে মানুষ বিনিয়োগ করতে পারবে তা চিন্তা না করেই মানুষকে ঋণ দেয়া হয়, যার ফলাফল শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্য খারাপই হয়।

প্রচলিত ধারণা হল এনজিওগুলো থেকে মহিলারাই ঋণ নেয় এবং তা ব্যবহার করে। কিন্তু আমরা অনেক এনজিও গ্রুপের সদস্যদের সাথে আলাপ করে জেনেছি যে তারা টাকা পেয়েই তা তাদের স্বামীর হাতে তুলে দেয় । আর স্বামীই ঠিক করে যে এই টাকা দিয়ে কি করা হবে। আবার অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী মিলেই সিদ্ধান্ত নেয়। একজন দরিদ্র মহিলার জন্য ঋণের টাকা একটি বড় অংকের টাকা। এই পরিমাণ টাকা হয়তো অনেকে একসঙ্গে জীবনে দেখেনি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা গেছে যে টাকা পাওয়ার পর পরিবারের পুরুষ কর্তাটি প্রথমেই যে কাজটা করে তা হচ্ছে সে বাজারে যায় এবং একটা বড় মাছ, মাংস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কিনে আনে। এভাবে ধীরে ধীরে তারা প্রায় সব টাকাই শেষ করে ফেলে আর ঋণ খেলাপীতে পরিণত হয়। আর যখন তারা ঋণ ফেরত দিতে অক্ষম তখন তারা এনজিও বিরোধীদের প্রচারণার খপ্পরে পড়ে মনে করে যে ঋণের টাকা ফেরত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

অনেক স্থানে (যেমন, সরাইল ও ভৈরব) দেখা গেছে যে, মহিলারা ঋণের টাকা উচ্চহারে অন্যদের সুদ দিচ্ছে। এনজিওর ঋণের টাকা বিনিয়োগের এটা আরেকটি সহজ পন্থা। অনেকেই আমাদের বলেছে যখন আমরা টাকা সুদের ব্যবসা তুলে দিতে চাইছি তখন এনজিওর সহায়তাপুষ্ট এভাবে নতুন সুদখোরের আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা এনজিওর জন্য দুর্নাম বয়ে আনে। এনজিও সমূহ শুধু ঋণ বিতরণ নয় ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সচেতন হবে এটাই আশা করা যেতে পারে। অর্থাৎ কে, কত টাকা ঋণ পেলো, ঋণের টাকা কোথায়, কিভাবে বিনিয়োগ করা হলো তার দিকে নজর দেয়া জরুরী। এনজিওগুলোর উচিত তাদের সমিতির সদস্যদের কখনোই যা ইচ্ছে তাই করার অনুমতি না দেয়া।

জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওর মধ্যে সম্পর্ক

বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরণের এনজিও রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। দেশের অনেক স্থানেই স্থানীয় ও ক্ষুদ্র এনজিও গুলো একসঙ্গে জাতীয় পর্যায়ের এনজিও গুলোর সঙ্গে কাজ করে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্থানীয় এনজিওগুলো স্থানীয় সংগঠন এবং জাতীয় এনজিওর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।

কিছু কিছু স্থানীয় এনজিও আমাদের জানিয়েছে যে অনেক জাতীয় এনজিওর উচ্চাভিলাষী কার্যক্রম বিস্তার এক ধরণের অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি তাদের মধ্যে মতদ্বৈতা তৈরী করে। আমরা মোটামুটিভাবে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছিঃ

- একই স্থানে প্রকল্প শুরু করা নিয়ে প্রতিযোগিতা;
- জাতীয় এনজিওগুলোর কর্মতৎপরতার সমন্বয়ের অভাব;
- ক্ষুদ্র এনজিওগুলোর প্রতি বড় এনজিওগুলোর অভিন্ন ও অনেক সময় প্রভাবশালী আচরণ;
- কোন নির্দিষ্ট একটি এলাকায় কোন কার্যক্রম হাতে নেয়ার আগে স্থানীয় এনজিওগুলোর সাথে পর্যাপ্ত আলোচনার অভাব;
- একই রকম প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সঠিক গন্তব্যকে জটিল করে তোলে এবং সঠিক গন্তব্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

এনজিও প্রকল্পের আওতাধীন এলাকাতে সমন্বয়ের অভাব তীব্রভাবে লক্ষণীয় । বিভিন্ন এনজিও-র সমজাতীয় প্রকল্প একই সময়ে একই জায়গায় বাস্তবায়নের জন্যে প্রতিযোগিতা ভুল বোঝাবুঝি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং বিদ্বেষের জন্ম দেয়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, বিভিন্ন এনজিও-র কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। দেশের ছোট ও স্থানীয় এনজিও গুলোর ভূমিকা বড় এনজিও গুলোর অনুধাবন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে বড় এনজিও গুলোর সঙ্গে স্থানীয় এনজিও এর বৈরী সম্পর্ক দূর হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রমের ভিত্তিস্বরূপ তারা কাজ করে।

এনজিও ও ধর্মীয় গোষ্ঠী

এনজিওর সঙ্গে মৌলবাদের বিরোধ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার। ক) সকল ধার্মিক মনের মানুষ কি মৌলবাদী? খ) এনজিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কিছু সংখ্যক মাওলানা ও মৌলবাদীদের দেয়া সব ফতোয়াকে কি আমরা এর সাথে যুক্ত করতে পারি? গ) এনজিওর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজদের সম্মুখীন হওয়ার কোন উদ্যোগ এনজিওগুলো কিভাবে দেখছে?

এই গবেষণায় (আলম ১৯৯৫) সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী ১৯২ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই এনজিও তৎপরতা ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও-র ভূমিকার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। ১৯২ জনের মধ্যে ১১৬ জন (৬১%) মনে করে এনজিওগুলো ধর্মবিরোধী নয়, আর ৭৬ জন (৪০%) এর ধারণা এনজিওগুলো ধর্ম বিরোধী। সাধারণভাবে এনজিও কর্মকাণ্ডকে যথার্থই মনে করা হয়।

এখানে ধার্মিক এবং মৌলবাদী মনোভাবাপন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই জরুরী। এটা বুঝতে হবে সব ধর্মীয় সংগঠনের ভেতরের সবাই মৌলবাদী নয় এবং এনজিও বিরোধী মন-মানসিকতাও পোষণ করে না। কেবল অতিরিক্ত রক্ষণশীল মন-মানসিকতার কিছু মানুষ ও ধর্মীয় নেতাই রক্ষণশীল এবং তারা সাধারণত ধর্মীয় আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয়।

অসন্তোষের মূল উৎস

মাঠকর্মের তথ্যের ভিত্তিতে অসন্তোষের মূল খোঁজার চেষ্টা করেছি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণই ইসলাম ধর্মীয় দলগুলোর অন্যতম অসন্তোষের কারণ। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এনজিওরা নারীদের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসছে এবং পর্দা না করতে তাদের উৎসাহিত করছে। এই ধরণের ধর্মীয় মতাদর্শ বিরাজমান পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ থেকেই তৈরী যা নারীকে ঘরের বাইরে এবং আর্থ-সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখতে উৎসাহিত করেছে। ধর্মীয় সংগঠনসমূহের বিরোধিতার প্রধান কারণগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

- বাড়ীর বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।
- দূরবর্তী স্থানে গিয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।
- বৈদেশিক সাহায্যের উপর বেশী নির্ভরতা; যা অনেক সময় খ্রীস্টান বা ইহুদী টাকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
- পুরুষের অংশ গ্রহণের সীমিত সুযোগ।
- ইসলাম বা আরবী শিক্ষাকে অবহেলা এবং সুযোগের অভাব।
- ধর্মান্তরের ভয়।
- সুদের উচ্চ হার।
- তুঁত গাছের চাষ।

ইসলামী ধর্মীয় সংগঠনগুলো এনজিও সমর্থিত ও উৎসাহিত আয় সংগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি করে থাকে। এ প্রসঙ্গে তারা বিভিন্ন ধরণের মত প্রকাশ করেন। 'এনজিও'রা পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে।

সাধারণ মানুষের সংসার ভাঙ্গার জন্য এটা এক ধরণের ষড়যন্ত্র।' 'যেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক আছে, যাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা দেয়া যায়, সেখানে নারীদের এত সহযোগিতা করা কেন?' 'থানা সদর বা অন্যান্য দূরবর্তী স্থানে নারীদের প্রশিক্ষণ কেন দরকার আর কেন স্থানীয়ভাবে এটার ব্যবস্থা করা যায় না।' 'এটা বুঝি না যে, একটি নারী কেন অনেক দিনের জন্য বাড়ীর বাইরে থাকবে।'

আমি মনে করি শুধুমাত্র এনজিওর সাথে ফতোয়াকে যুক্ত করার কোন কারণই নেই। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অনেক স্থানে ফতোয়া নামের সামাজিক কলঙ্ক নতুন নয়। এটা দেশের প্রচলিত আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। আশার ব্যাপার এটাই যে, অনেক ফতোয়াবাজের অন্যায়, শোষণ আর উন্নাসিকতার খবর অধুনা সংবাদপত্রে বের হচ্ছে, যা কিছু দিন আগেও হতো না। এটা অনেকেরই বিবেককে নাড়া দিয়েছে আর ফতোয়াবাজদের অন্যায় কাজকর্মের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সোচ্চার করে তুলেছে। সুশীল সমাজের অনেক স্তর থেকেই ফতোয়া বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে।

উন্নয়ন সম্পর্কে ধর্মীয় নেতাদের প্রত্যয়ন

ধর্মীয় নেতারা উন্নয়ন, উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলোকে বিভিন্নভাবে প্রত্যয়ন করে। ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টিতে উন্নয়ন হল ঃ

- ইসলামী মূল্যবোধ ও শরীয়তের বিধানের প্রতিফলন।
- বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করে নিজের যা আছে তার উপরেই নির্ভর করা।
- যাকাত সংগ্রহ ও সুষ্ঠুভাবে বন্টন।
- অশিক্ষা দূরীকরণ।
- আরবী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।
- সুদ-মুক্ত ঋণ।
- সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের অংশগ্রহণ।
- বেকারত্ব দূরীকরণ।
- মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আরো বেশি সহায়তা।
- স্থানীয় সম্পদগুলোকে উন্নয়নের জন্য আরো গতিশীল করা।

সূত্রঃ মাঠকর্ম।

ইসলামী ধর্মীয় সংগঠনগুলোর অসন্তোষ ও আপত্তিগুলো সহজেই খণ্ডন করা সম্ভব এবং মোকাবেলা করা সম্ভব। কিছু বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যা অনুধাবন করে

অগ্রসর হলে তাদের অধিকাংশ আপত্তিরই মুখোমুখি হওয়া যায় এবং সমস্যার সমাধান করা যায়। আমাদের অবশ্যই সমস্যাগুলোকে যারা সমস্যা মনে করছেন তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। এটাও বুঝতে হবে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষক এবং ধর্মীয় নেতা মৌলবাদী প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হন। তাই এনজিওদের কার্যক্রম এবং জনগণের উপরে এর শুভ ও ভাল প্রভাবগুলো অনেক সময় অপ্রকাশিত থাকে ফলে সমস্যা ঘনীভূত হয়। এসকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এ জাতীয় কোন উদ্যোগ এনজিওদের পক্ষ থেকে তেমন নেয়া হয়নি। অনেক এনজিও নেতাই মনে করেন যে, এনজিও গুলোর উচিত এ সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করার জন্যে স্থানীয় জনগণ ও এনজিও সমর্থক ধর্মীয় নেতাদের সাহায্য নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কোন অবস্থাতেই ধর্মীয় গোষ্ঠীকে প্রতিপক্ষ মনে করা ঠিক হবে না। সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ কিন্তু মৌলবাদী নয় সকলকে তা অনুধাবন করতে হবে।

এনজিও ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসিত সংস্থাগুলো ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সংগঠন রয়েছে, যেমন- শালিস, সমাজ, গোষ্ঠী ও বাড়ী। বহু বছর ধরেই এই দুই ধরণের সংগঠন দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে আসছে। এদের ভেতর অনেক উত্থান-পতন, মিল-অমিল থাকলেও এরা এখনও পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। গত কিছুকাল যাবত এটা লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করতো এখন এনজিওগুলো এধরণের অনেক কাজই করছে। এর ফলে একদিকে যেমন এনজিওদের নিজেদের ভেতরে তেমনি অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলোর মাঝে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এনজিওর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলো নিজেদের মূল্যহীন ভাবতে শুরু করছে যা বাঞ্ছনীয় নয়।

দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এনজিও-র ভূমিকার বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ১৯৯০ এ এরশাদ পতনের আন্দোলনের আগে পর্যন্ত মোটামুটিভাবে এনজিওগুলো রাজনীতির মূলধারা থেকে দূরে ছিল। ১৯৯০ এ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় কিছু এনজিও নেতা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। এটাকে অনেক রাজনীতিবিদও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে এনজিও কর্মকাণ্ডকে সঠিক, গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা বলে মনে করেন। এরশাদের পতনের পরের সংসদীয় নির্বাচনের সময় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য যখন এনজিওরা আবারও

তৎপর হলো এবং অংশ নিলো তখনও প্রশ্ন উঠলো- এনজিওরা কোন আইনের আওতায় নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করে? এবং তারা কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? (হোয়াইট, ১৯৯২)

এ প্রসঙ্গে কিছু এনজিও নেতার কোন এনজিও কর্মী নিজেদের পছন্দমত রাজনৈতিক নেতার জন্য প্রচারণা চালাতে পারে, এতে তারা বাধা দেন না। এটা প্রত্যেক সদস্যের গণতান্ত্রিক অধিকার বলেই মনে করা হয়। মাঠকর্মের সময় জানা গেছে যে, কিছু এনজিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সমর্থিত প্রার্থীকে সাহায্য করেছে (হাশেমী ১৯৯৪, ওয়েষ্টারগার্ড ১৯৯২)। হাশেমী (১৯৯৪) দেখিয়েছেন যে, গণসাহায্য সংস্থা শুরু থেকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার জন্য কাজ করেছে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা করার মতো শক্তিশালী করে তুলেছে। নীলফামারীতে গণসাহায্য সংস্থা দরিদ্র জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদে তাদের নিজেদের ভেতর থেকে সদস্য নির্বাচনের জন্য সংগঠিত হতে সাহায্য করেছে।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে সহায়তা করার ফলে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সাথে এনজিও গুলোর প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নিলফামারীতে জিএসএস সদস্যরা যখন চেয়ারম্যান ও অন্যান্য আসন পেয়ে যায় তখন স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর ভেতরে একধরনের ভীতির জন্ম হয়।

স্থানীয় নেতাদের মতামত

স্থানীয় পর্যায়ে এনজিও-র ভূমিকা সম্পর্কে মতামত জানার জন্যে চারটি জেলার চারটি থানার নয়টি ইউনিয়নের ৫১ জন ইউনিয়ন পরিষদ নেতার সাথে কথা বলি। এদের মধ্যে ৪৬ জন ছিলেন সদস্য ও পাঁচ জন ছিলেন চেয়ারম্যান। এছাড়া গ্রামের প্রবীণ, সমাজ ও শালিসের নেতাদের এনজিও কার্যক্রমের ব্যাপারে মতামত জানা হয়। যেখানে মাঠ গবেষণা করা হয় সেখানে অনেকগুলো এনজিও কাজ করছিল এবং এখানকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বাররা এনজিওদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সচেতন এবং কেউ কেউ স্থানীয় এনজিও-র সাথে একযোগে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। সাক্ষাৎকারগুলো থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ নেতাই মনে করেন যে, এনজিও হচ্ছে Private Voluntary Organization (PVO's)। ইউনিয়ন পরিষদ নেতারা মনে করেন, সরকারের উচিত এনজিওগুলোকে আরো গুরুত্ব দেয়া এবং একই সাথে স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে গুরুত্ব দেয়া এবং কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা। ৩৪ জন (৬২%) উত্তরদাতা খুবই হতাশার সাথে জানালেন যে তাদের এলাকায় নতুন কোন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের আগে এনজিওগুলো তাদের সাথে আলোচনা করে না। নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, অনেক সময়

ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে এনজিওগুলো আলোচনা করে কিন্তু সাধারণ সদস্যদের সাথে নয়।

যখন আমরা ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে জানতে চাইলাম এনজিওদের ভূমিকা বাড়তে থাকায় তাদের কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে, তখন খুবই মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। এক তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা জানাল তাদের কিছু কিছু সমস্যা হচ্ছে। আর বাকিরা বলল তাদের কর্মকাণ্ড আলাদা এবং তারা মনে করে এনজিও ইউপির মতো ততোটা পরিচিত নয়। অনেকেই বললেন যে, এনজিওগুলো তাদের বিশ্বাস করে না। তাদের 'অসৎ' মনে করে এবং তাদেরকে 'টাউট' বলে। ৫১ জন ইউপি নেতার ভেতরে কয়েকজনের মন্তব্য নীচে দেয়া হলো। এই মন্তব্যগুলো থেকে এনজিও কর্মকাণ্ডের বর্তমান চেহারা উঠে আসবে যা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার জন্যেও প্রযোজ্য হতে পারে বলে মনে করি। এনজিওগুলো তাদের সাথে আলোচনা না করায় ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের অনুভূতি নিম্নে দেয়া হলঃ

- আমি খারাপ বোধ করি। একজন নির্বাচিত স্থানীয় নেতা হিসেবে আমার এলাকায় কি ঘটছে তা জানার অধিকার আমার আছে।
- দুঃখ পাই। এনজিও-র জনগণের ভোটের দাম দেয় না।
- আমরা যদি কিছু বলি তারা আমাদের বিরুদ্ধে অর্থহীন অপপ্রচার করে।
- ভ্রুক্ষেপ করি না।
- তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং তারা কি করে না করে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।
- তারা দেশটাকে ধ্বংস করছে কিন্তু আমাদের কিছুই করার নেই।
- আমরা নির্বাচিত নেতা। সাধারণ জনগণের ভেতর আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

যদিও এই মন্তব্যগুলোর মাধ্যমে ইউপি নেতাদের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে, তবুও এটা কখনোই এনজিও কার্যক্রমে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ৪২ জন (৮২%) উত্তরদাতা বলেন তাদের সাথে এনজিওদের কোন বিরোধ নেই। সাধারণতঃ অধিকাংশ ইউপি সদস্য ভালোভাবেই এনজিওদের মূল্যায়ন করে ও তাদের আচরণ ও ভালো।

৩২ জন (৬৫%) ইউপি নেতা বলেন যে এনজিওরা দরিদ্রদের জন্য এবং দেশের ভালোর জন্য কাজ করছে। মাত্র ১৮ জন (৩৫%) ইউপি নেতা এনজিওদের কর্মকাণ্ডে খুশি নয়। তাদের এই অসুখীর প্রধান কারণগুলো হয় তারা মনে করছে এনজিওরা তাদের গুরুত্ব দিচ্ছে না, এনজিওর ভূমিকা সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা এবং এনজিও কর্মকাণ্ডে নারীদের লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি।

এনজিওগুলো কিভাবে দেশের কল্যাণ করছে এ ব্যাপারে ইউপি নেতারা অনেক ধরণের উত্তর দিলেন। আমরা এনজিও সম্পর্কে যা জানি ও শুনি, উত্তরগুলোতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে যে, যদিও ইউপি নেতারা তাদের এলাকায় এনজিওর ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে সন্তুষ্ট না, তবুও এনজিওর যে কিছু সুফল আছে সে সম্পর্কে তারা সজাগ। আমি মনে করি, সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই অনুভূতিকেও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। নীচে এনজিও কার্যক্রমের বিষয়ে ইউপি নেতাদের চিন্তা-ভাবনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

- সাধারণ জনগণকে সাহায্য করছে।
- অনেক বেকার মানুষ চাকরী পাচ্ছে।
- দরিদ্র জনগণকে প্রদত্ত ঋণ তাদের আত্ম প্রত্যয়ী করে তুলছে।
- এনজিওদের কারণে দরিদ্ররা টিকে আছে।
- মহিলারা বেশি সুবিধা পাচ্ছে।
- বিধবারা স্বাবলম্বী হতে পারছে।
- স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য-বিধির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।
- সরকারের কর্মকান্ডে সহায়ক হচ্ছে।
- রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে গ্রামের জনগণকে সচেতন করছে।
- মহিলারা এখন সংগঠিত শক্তি।
- জনগণ এখন তাদের অধিকার সম্বন্ধে বেশি সচেতন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ৩৫ জন (৬৯%) ইউপি নেতা মনে করেন যে এনজিও গুলো ভবিষ্যতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি এবং তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইউপি নেতাদের এই ধারণার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। তারা বলেন যে, এনজিওগুলোর প্রচুর টাকা আছে তারা, অনেক বেশি সংগঠিত, প্রভাবশালী এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে সন্তুষ্ট করে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে থাকে। একটি উপজেলা পরিষদের কিছু সদস্য মনে করেন এনজিওগুলো অনেক শক্তিশালী। কারণ তারা টিএনও, ডিসি এবং অন্যান্য স্থানীয় অফিসারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে থাকে। এনজিওগুলো ভবিষ্যতে কেন ইউনিয়ন পরিষদের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে তা নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

- এনজিওগুলো গ্রাম স্তর থেকেই সংগঠিত।
- বর্তমানে তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে।
- তাদের টাকা আছে।

- তারা সরকারী নীতিমালাকে প্রভাবিত করতে পারে।
- এনজিওগুলো তাদের সদস্যদের ভোটদানে প্রভাবিত করতে পারে।

যদিও এনজিওগুলো বিভিন্ন নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নয়, তবুও ইউনিয়ন পরিষদের এবং অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মনে করেন এনজিওরা তাদের সদস্যদের নির্দিষ্ট কিছু দলের জন্য ভোটদানে প্রভাবিত করতে পারে। ইউপির একজন সদস্য জানালেন যে একজন মহিলা এনজিও দলনেত্রী একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে বলেছিলো, একশজন নারী সদস্য ঐক্যবদ্ধ আছে, বলুন আপনি আমাদের জন্য কি করবেন (আলম ১৯৯৭)।

এনজিওগুলো রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কিনা এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে আমরা সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাইনি। তবে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে যে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের কিছু এনজিও তাদের সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলো এবং তাদেরকে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছিলো। এটাকে পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততা হিসাবে মনে করা হয় তাই অভিযোগ করা হয়েছিল যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তারা তাদের সদস্যদের কিছু নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেছিল। তবে এ তথ্যগুলোকে সাধারণীকরণ না করে আরো সুস্পষ্ট উদাহরণের ভিত্তিতে এসকল ইস্যুগুলো বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি মনে করি যেহেতু এ জাতীয় কথা উঠছে তাই এ নিয়ে আরও ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা হওয়া দরকার। ঢাকায় একজন এনজিও নেতা আমাকে বলেছিলেন, আমাদের সদস্যরা সমাজেরও সদস্য আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা অবশ্যই তাদের রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা কখনোই বাধা সৃষ্টি করি না। আমি মনে করি এ বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি যথাযথ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

উপসংহার

এনজিও এখন বাংলাদেশে একটি বহুল পরিচিত নাম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে, তবু স্বচ্ছতার অভাব এবং এনজিওদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার মন-মানসিকতার জন্য সমাজের একটি বড় অংশে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এনজিওদের উচিত এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে তাদের কর্মকাণ্ডে আরো স্বচ্ছতা আনা।

বাংলাদেশে এনজিওগুলোর কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিগুলোর মধ্যে আয় সংগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ অন্যতম। ধর্মীয় ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ভূমিকা ও মানসিকতার ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে জোর দেয়া হয়েছে যে নারী পুরুষের সম্পর্কের বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তন আনতে না পারলে এনজিওদের কর্মকাণ্ড থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সুফল পাওয়া যাবে না। তাই

এনজিওর সাফল্য নির্ভর করছে সমাজ ব্যবস্থায় কাঠামোগত ও মতাদর্শিক পরিবর্তন আনার উপর।

স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর সঙ্গে স্থানীয় সংস্থাগুলোর বিরোধমূলক সম্পর্কের অধিকাংশ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে এনজিওগুলো ভালো কাজ করছে কিন্তু তাদের প্রধান ক্ষোভ হল যে এনজিওগুলো কোন এলাকায় কাজ শুরু করার আগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে না। এই মনোভাব গুরুত্বের দাবী রাখে। অনেক ইউপি নেতাই এনজিওদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে শংকিত। তারা অনেকেই মনে করেন যে, যেহেতু এনজিওর টাকা আছে এবং তারা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অফিসারদের (কর্মকর্তাদের) সাথে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলে, তাই একদিন ইউপি নেতারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি যথাযথ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। এনজিও ও সরকারের স্থানীয় সংস্থাগুলোর মাঝে সমঝোতার কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে সরকারের নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আরেকটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এনজিওদের কাজের কৈফিয়ত ও দায়বদ্ধতা। বাংলাদেশের এনজিওগুলো তাদের অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক দাতাদের উপরে নির্ভরশীল। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকা এক ধরণের মুখাপেক্ষিতার সম্পর্ক তৈরী করছে, যা তাদের কার্যক্রমের স্বাধীনতা খর্ব করে (হাশেমী ১৯৯৪)। তাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর থেকে সাধারণ জনগণের কল্যাণের জন্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা কতটুকু সম্ভব তা ভাববার সময় এসেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

এই প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রিপ-ট্রাস্ট ও জাহাঙ্গীরনগর মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের আর্থিক সহযোগিতায়। গবেষণার কাজে সহায়তা করেছিল মাহবুবুল আলম, সুলতান আহমেদ, অবন্তী হারুন, সিদ্দিকুর রহমান ও রুমেল হালদার। স্নেহভাজন ফারুক হোসেন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে প্রবন্ধের প্রুফ দেখে দিয়েছেন।

Bibliography

Alam, S. M. Nurul, 1997, NGO and Local Institutions in Bangladesh: A Study of Relations and Coexistance. A Research Report. Center for Human Resource Development. Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, 66p.

Alam, S. M. Nurul, 1995, NGOs Under Attack : A Study of Socio-cultural and Political Dynamics of NGOs Operations in Bangladesh, Department

of Anthropology, Jahangirnagar University, February 1995, (mimeographed)

Alam, S. M. Nurul, Rasheda Akhtar and Ishrat Ahmed, 1995. Women in Development : Experience of NGOs in some villages of Kapasia thana of Gazipur District. Empowerment, Vol. 2, pp. 31-54.

Alam, S. M. Nurul, 1990, Problems and Prospects of NGOs as Institutional Alternative in Alleviating Poverty in Bangladesh. Paper presented at the 11th European Conference on Modern Asian Studies, Amsterdam, Netherlands, July 2-5, 1990.

Foster, George M., 1965, Peasant Image of Limited Goods. American Anthropologist, Vol. 67, No. 2, reprinted in Poter et. al. Peasant Society, Little Brown Boston, pp. 300-323

Hashemi, Syed M., 1994, NGO Accountability in Bangladesh : Beneficiaries Donors and the State. Paper presented at the Workshop on NGOs and Development, Performance and Accountability. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Manchester, UK, June 27-29, 13p.

Hashemi, Syed M., 1993, State and NGO support Network in Rural Bangladesh : Conflicts and Coalitions for Control. The Jahangirnagar Review Vol. 8, NO. 1, pp. 1-13.

Kabeer, Naila, 1991, Gender Dimensions of Rural Poverty : Analysis from Bangladesh. The Journal of Peasant Studies. Vol. 18, No. 2, pp. 241-262.

Nahar, Ainun, 1996, Gender Religion and Rural Development in Bangladesh. MA dissertation, Social Anthropology, University of Sussex, August 30, 1996.

White, Sarah C., 1992, NGOs and the state in Bangladesh : The Struggle for national Identify. Paper presented at the Third Workshop of the European Network of Bangladesh Studies. Hornbank, Denmark, August 27-29.

Westergaard, Kirsten, 1992, NGOs, Empowerment and the State in Bangladesh. Paper presented at the Third Workshop of the European Network of Bangladesh Studies. Hornbank, Denmark, August 27-29, 21p.